

শহীদের জীবনী

বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং আত্মত্যাগের বিনিময়ে পাওয়া আমাদের ২৪ এর স্বাধীনতা। এ স্বাধীনতা অমূল্য। ২৪ এর অন্যতম বীর দেশপ্রেমিক শহীদ মুত্তাকিন বিল্লাহ। তিনি ছিলেন একজন মেডিকেল টেকনোলজিস্ট। মুত্তাকিনের জন্ম ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর মাসের ১৫ তারিখ। জন্মস্থান মাগুরা জেলার দাড়িয়াপুর ইউনিয়নের শ্রীপুর থানার বরইচরা গ্রামে।

পারিবারিক জীবন

শহীদ মুত্তাকিন বিল্লাহর পিতার নাম মৃত মো: আক্কাস আলী এবং মাতা মোসা: রহিমা বেগম। সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করেন শহীদ জননী। তিনি একজন পুরাদস্তুর গৃহিণী। জনয়িতার মৃত্যুর পর মুত্তাকিনদের সংসারের হাল ধরেন তাঁর বড় ভাই। একমাত্র অবলম্বন জনাব মো. শিহাবুল ইসলাম (৩৫) একজন মালয়েশিয়া প্রবাসী। পিতার হঠাৎ মৃত্যুতে সংসারের সকল দায়িত্ব তাঁর উপরে বর্তায়। শহীদ পরিবারে মোট সদস্য সংখ্যা সাতজন। মহাবীর মুত্তাকিন সংসারের সহযোগিতা করতে একটি প্রাইভেট মেডিকেল হাসপাতালে যুক্ত হন। কিছুদিন পর স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে ঢাকার মিরপুরে ভাড়া বাসায় ওঠেন। এভাবেই চলছিল তাঁদের সংসার জীবন ছোট নাফিয়ানের কী ওর বাবার কথা মনে থাকবে? বাবার কোনো স্মৃতি নিয়ে নাফিয়ান স্মৃতিচারণ করবে? মুত্তাকিনের স্ত্রী কয়দিনই বা সংসার করতে পারলেন স্বামীর সাথে? সারাজীবন কেবল অল্প কিছু সুখস্মৃতি আঁকড়েই তো বেঁচে থাকতে হবে তাকে। বাবার স্মৃতি মনে করতে না পারলেও বাবাকে নিয়ে অনেক গর্ব করতে পারবে শহীদ মুত্তাকিন বিল্লাহ পুত্র আন নাফিয়ান ব্যক্তিজীবন

শহীদ মুত্তাকিন বিল্লাহ চিকিৎসা সমবায় ক্যারিয়ার গড়ার জন্য মেডিকেল টেকনোলজিস্ট হিসেবে ক্যারিয়ার গড়েন। মেডিকেল টেকনোলজিস্ট হিসেবে কাজ করছিলেন মিরপুর-১৪ রাজনীগন্ধা টাওয়ারের ইনোভা ডায়াগনস্টিক সেন্টারে। সংসার পেতেছিলেন রাজধানীর মিরপুর-১ সংলগ্ন এলাকায়। ছোট্ট সেই সংসারে ছিলেন শহীদ মুত্তাকিনের স্ত্রী ও একমাত্র ছেলে আন নাফিয়ান হোসেন (৪) পরিবার এবং আত্মীয়স্বজনের মাধ্যমে জানা যায় শহীদ প্রচণ্ড যত্নবান একজন মানুষ ছিলেন। শত ব্যস্ততার মাঝেও খোঁজ রাখতেন তাঁর আপনজনদের। মা ঠিকমতো ওষুধ খেলেন কিনা, কে কেমন আছে সকল খোঁজই তিনি রাখতেন। তেজস্বী বীর পরিবারের সবচেয়ে প্রিয়মুখ ছিলেন। রাজধানী শহরের যান্ত্রিক খরচাদির পরও কিছু টাকা মায়ের হাতে পাঠাতে ভুল করতেন না মুত্তাকিন।

শাহাদতের প্রেক্ষাপট

মাত্র ২৫ বছরের জীবন। সবাই তো এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে চায়। অথচ মুত্তাকিনকে মাত্র ২৫ বছর বয়সে প্রিয়তমা স্ত্রী, আদরের সন্তান ছোট্ট নাফিয়ান, মা আর পরিবারের বাকি সদস্যদের রেখে সুন্দর এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হলো। অথচ মুত্তাকিন তো স্বার্থপর হতে পারতেন আরো। স্ত্রী সন্তানের কথা ভেবে আন্দোলনে নাও যেতে পারতেন। কিন্তু মুত্তাকিনরা পিছুটানে আটকান না, মৃত্যুভয়ে ভীত হন না।

কারণ তাঁরা জানেন- ‘আল্লাহ তা’আলার বাণী, ‘আল্লাহ মুমিনদের নিকট থেকে তাদের জান ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন এর বিনিময়ে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত।’ (আত তাওবাহ : ৯: ১১১-১১২)

শহীদের স্ত্রী নাস্টমা এরিন নিভুর বর্ণনায় শাহাদাতের পটভূমি

"৪০ মিনিট আগেও যে আমাকে বলছিল “টেনশন করো না, আমি ঠিক আছি,” সে এখন নেই—এটা কীভাবে বিশ্বাস করি, বলেন?"

পেশায় আমার হাসপাতাল একজন মেডিকেল টেকনোলজিস্ট, উনি কাজ করতেন ইবনে সিনাতে। আমিও পেশায় একজন মেডিকেল টেকনোলজিস্ট। জুলাইয়ের আন্দোলন শুরুর পর থেকেই আমার স্বামী এই আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। প্রতিদিন ডিউটি শেষে তিনি আন্দোলনে যোগ দিতেন।

১৮ জুলাই রাতে ১১টার সময় ডিউটি শেষ করে যখন তিনি বাসায় ফিরছিলেন, তখন মিরপুর ১০ নম্বর থেকে তাঁর উপর আক্রমণ করা হয়। তিনি আমাকে কিছু জানাননি কারণ জানালে আমি তাঁকে আন্দোলনে যেতে নিষেধ করতাম, কারণ আমাদের একটি ছোট বাচ্চা আছে, তাই তিনি প্রাথমিকভাবে ব্যাপারটা আমার কাছে হাইড করেন। তাঁর শরীরের নানা জায়গায় রাবার বুলেট লাগে। তিনি বাসায় আসার পর বিষয়টি লুকানোর চেষ্টা করেন, কিন্তু আমি তা দেখে ফেলি এবং প্রাথমিক চিকিৎসা দেই সেদিন।

তারপরের দিন সকালে তিনি ডিউটিতে যান। তাঁর ডিউটি ছিল সকাল ৮টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত। ২টায় কাজ শেষ করে তিনি মিরপুর ১০ নম্বরে আন্দোলনের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তখন থেকেই আমি তাঁর সঙ্গে বারবার ফোনে কথা বলছিলাম। শেষবার বিকেল ৪টার দিকে, আসরের আজানের সময়, তাঁর সঙ্গে আমার কথা হয়। তখন তাঁর গলা একদম বসে গিয়েছিল। আন্দোলনের প্রথম সারিতে থেকে স্লোগান দেওয়ার কারণে আর অতিরিক্ত ঘামে গরমে তাঁর গলা বসে যায়। তিনি আমাকে শেষ কথোপকথনে বলেন, “টেনশন করো না, আমি ঠিক আছি। আজ তো সবাই আন্দোলন করছে—মহিলা থেকে শুরু করে বাচ্চা, বৃদ্ধ সবাই নেমেছে রাস্তায়। আমি কিভাবে ঘরে বসে থাকি? নিজের কাছে নিজে কী জবাব দেব?” এটাই ছিল তাঁর সঙ্গে আমার শেষ কথা। সেদিন এই কথা বলার কিছু মুহূর্ত পরেই মিরপুর ১০ নম্বর গোল চত্বর থেকে তাঁর মাথায় গুলি লাগে সরাসরি। একটি গুলি তাঁর মাথা ভেদ করে আরেক পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়, আর দ্বিতীয় গুলি তাঁর মাথাতেই আটকে যায়। আমার কাছে সঙ্গে সঙ্গেই ফোন আসে, এবং আমি সেখানে চলে যাই। কিন্তু আমি তাঁকে সেখানে পাইনি। সেখানকার এক ভাই তাঁকে মিরপুর আল-হিলাল হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়, মাথায় ব্যান্ডেজ করা হয়। কিন্তু তাঁর অবস্থার অবনতি দেখে তাঁকে ইবনে সিনা কল্যাণপুর ব্রাঞ্চ স্থানান্তর করা হয়। পরে জানতে পারি, সেখানে যাওয়ার পর অনেক ভালো ভালো ডাক্তার তাঁর ট্রিটমেন্টে এগিয়ে এসেছিলেন।

অনেক চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু তাঁর আর জ্ঞান ফিরে আসেনি। কোনোভাবেই তাঁর আর জ্ঞান ফিরে আসেনি। তাঁর ইবনে সিনাতে থাকার খবর পেয়ে আমি সেখানে ছুটে গিয়েছিলাম। কিন্তু ছাত্রলীগ ইবনে সিনায় যাওয়ার এবং হাসপাতালের মুখে তৎপর ছিল। কোনোভাবেই যেতে দেবে না। আমি সেখানে তাদের হাত-পায়ে ধরে কাঁদছিলাম, কিন্তু তারা আমাকে ঢুকতে দেয়নি। তার মধ্যে আমার কাছে আরেকটা কল আসে। বলা হয় আমার স্বামী নাকি সোহরাওয়ার্দীতে। আমি আবার ওখান থেকে সোহরাওয়ার্দীতে যাই। ২ তলা থেকে ৫/৬ তলা আমি পাগলের মতো কতবার ছোট্টাছুটি করেছি, আমার হিসাব নেই।

সেদিন আমি যতগুলো লাশ দেখেছি, জীবনে এত লাশ দেখিনি। আমি সব লাশ উল্টে উল্টে দেখছিলাম আমার স্বামী কিনা। সেখানেও আমি তাঁকে খুঁজে পাইনি। পরে আবার কল করি ওই নম্বরে। তখন বলা হয় নিউরো সায়েন্স বিভাগে যেতে হবে আমাকে। পরে সেখানেও যাই। কিন্তু ওখানেও কোনো এফ্রি নেই, কোনো তথ্য নেই, কিছুই নেই। সেদিন শুধু লাশ আর লাশ। এত রেকর্ড রাখাও কি সম্ভব, আমি জানি না। ডাক্তাররা শুধু রোগী পাচ্ছিল আর যেভাবে পারছিল চিকিৎসা দিচ্ছিল। আর যারা মারা যাচ্ছিল, সবাইকে আলাদা রুমে সরিয়ে দিচ্ছিল।

ওই দৃশ্য আমি এখনো ভুলতে পারি না। শেষে আরেকটা কল আসে। বলা হয় তিনি ইবনে সিনাতেই আছেন, আইসিইউ-তে ৯ তলায় আছেন। শেষ পর্যন্ত আমি তাঁকে সেখানেই খুঁজে পাই। সেখানেই তাঁর সার্জারি চলছিল। কিন্তু ইবনে সিনায় সেদিন ছাত্রলীগ ঢুকে পড়ে এবং অনেক সমস্যা করছিল। ট্রিটমেন্ট করতে দেবে না। ডাক্তাররাই পরে আমার হাসব্যাঙ্কে আমার কাছে হ্যাণ্ডভার করে বলেন, এখানে রাখা যাবে না। তাঁকে নিউরোসার্জারি ডিপার্টমেন্টে নিয়ে যেতে হবে, কারণ তাঁর মাথায় বুলেট লেগেছে। এই সমস্যার ভালো চিকিৎসা সেখানেই হবে। তাই আমি তাঁকে নিয়ে নিউরো সায়েন্সে যাই। কিন্তু সেখানেও তারা মানা করে দেয় যে ট্রিটমেন্ট করা হবে না। কারণ ততক্ষণে ওখানেও লীগ-এর হামলা শুরু হয়ে যায়। পরে যখন রাত ১০টা বাজে, আর কোনো উপায় না পেয়ে আমি যেখানে চাকরি করি, সেখানে তাঁকে ভর্তি করাই ইমার্জেন্সিতে। ফজর পর্যন্ত আমার স্বামী বেঁচে ছিল। সারারাত তাঁকে ব্লাড দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাঁর শরীর কোনো ব্লাড নিচ্ছিল না। নাক দিয়ে, মুখ দিয়ে, কান দিয়ে সব রক্ত বের হয়ে যাচ্ছিল। পুরো রাত তাঁর ব্লিডিং হয়েছে। আমি শুধু এই আশায় ছিলাম যে তাঁর একবার জ্ঞান আসবে। কিন্তু তাঁর জ্ঞান আসেনি। একবারও চোখ খোলেনি। একটুও রেসপন্স করেনি। শেষে ফজরের আজানের সময় আমার স্বামী মারা যায়। ঠিক সময়ে চিকিৎসা পেলে হয়তো আমার স্বামী বেঁচে থাকত। এই একটা কষ্ট আমি নিজেকে বুঝাতে পারি না। আমি হাসপাতাল থেকে হাসপাতালে ছুটেছি, কিন্তু নিজের স্বামীকে চিকিৎসা দিতে পারিনি। আমার তিন বছরের একটা বাচ্চা আছে। সে তো বুঝে না যে তার বাবা আর নেই। আমি আমার ছেলেকে কী বলবো বলেন? যে আমি হাসপাতালে গিয়েছিলাম, কিন্তু তারা চিকিৎসা দিতে পারেনি? যে দেশের জন্য তাঁর বাবা জীবন দিতে রাজি ছিল, সেই দেশের হাসপাতালগুলোর সামনে গুলি বাহিনী দাঁড়িয়ে থাকে যাতে রক্ত বরানো মানুষ চিকিৎসা নিতে না পারে? আমার ছেলে এখনো কাগজের প্লেন বানায়। ভাবে তার বাবা আসবে, তার সাথে খেলবে। আমি উত্তর দিতে পারি না দেখি আর নিজের কান্না লুকাই।

আমার নিজেরই বিশ্বাস হয় না, যে মানুষটা সকালে আমার সাথে কথা বলে নাস্তা খেয়ে আমার সামনে দিয়ে বের হলো, যার সাথে আমার এতবার ফোনে কথা হলো, ৪০ মিনিট আগেও যে আমাকে বলছিল “টেনশন করো না, আমি ঠিক আছি,” সে এখন নেই—এটা কীভাবে বিশ্বাস করি, বলেন? তবে যাই হোক, দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছে আমার স্বামী। সে এখন এই দেশের শুধু আমার একার না। এটা ভাবলেও গর্ব হয়। সে আমাকে আজীবনের কষ্ট আর গর্ব একসাথে দিয়ে গেল। আমি একজন শহীদের স্ত্রী। একজন শহীদের ছেলে বড় করছি। এটাই আমার সম্বল।

একনজরে শহীদের পরিচয়

শহীদের নাম : শহীদ মুত্তাকিন বিল্লাহ

জন্ম : ১৫.১২.১৯৯৯

মৃত্যু : ১৯ জুলাই, ২০২৪

কবর : বড়ইচারা মসজিদ কবরস্থান, মাগুরা

জন্মস্থান : মাগুরা

স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: বরইচারা, ইউনিয়ন: দাড়িয়াপুর, থানা: শ্রীপুর, জেলা: মাগুরা

পেশা : মেডিকেল টেকনোলজিস্ট, ইনোভা ডায়াগনস্টিক সেন্টার

রজনীগন্ধা টাওয়ার, মিরপুর-১৪, ঢাকা

শহীদ হওয়ার তারিখ : ১৯.০৭.২০২৪

পিতা : মো: আক্বাস আলী

মাতা : রহিমা বেগম

পরিবারের সদস্য সংখ্যা : ০৭ জন

: মো: শিহাবুল ইসলাম (৩৫), প্রবাসী, (বড় ভাই)

প্রস্তাবনা

১. শহীদের স্ত্রীকে মাসিক বা এককালীন সহযোগিতা করা যেতে পারে

২. শহীদ পুত্রকে লেখাপড়ার দায়িত্ব নেয়া যেতে পারে